ই-পেপার

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৭, সংখ্যা: ৬ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | সেপ্টেম্বর ২০১৬

জানা অজানা

পৃথিবীর মতোই এক গ্রহ

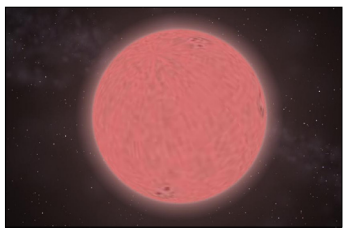

পৃথিবীর মতো এক গ্রহের সন্ধান মিলেছে। আমাদের সূর্যের সব চেয়ে কাছের যে নক্ষত্র, তার চার পাশে ঘুরছে সেই গ্রহ। আমাদের ওই প্রতিবেশী সূর্যের নাম 'প্রক্সিমা সেনটাউরি' **(ছবি)**। মহাকাশে দূরত্বের নিরিখে প্রক্সিমা সেনটাউরির খুবই কাছে অবস্থিত – মাত্র ৪.২ আলোকবর্ষ দূরে।

তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে পৃথিবীর মতো যে গ্রহটি, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রক্সিমা বি'। সেটি এমনই এক কক্ষ পথে ঘুরে চলেছে, যেখানে জল স্থিতিশীল থাকে। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভারসিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক গুইলেম আঙ্গলাডা-এসকুডে স্পেস.কম-কে বলেছেন, তিনি মনে করেন এই আবিষ্কারের পর সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজাটাই হবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

গত ১৫ বছর ধরে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রক্সিমা সেনটাউরির ওপর নজর রাখছিলেন। তাঁরা অনুমান করছিলেন ওই ৪.২ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের সৌরজগতে পৃথিবীর মতো কোনও এক গ্রহ থাকতে পারে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলি যত শক্তিশালি হয় ততই সেই দূরের জগতের ছবিটাও স্পষ্ট হতে থাকে। অবশেষে গত মাসে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন, সত্যিই, পৃথিবীর মতো কিন্তু ১.৩ গুণ বড় এক গ্রহ দেখা গেছে প্রক্সিমা সেনটাউরি-র সৌরমন্ডলে।

কামড়, মহাকামড়, সেরা কামড়

কার কমড়ে কত জোর - প্রতিযোগিতায় তারকারা

এটা প্রতিযোগিতার যুগ। টেলিভিশন খুললেই দেখা যায় হরেক রকম প্রতিযোগিতা চলছে নানা রকম চ্যানেলে। সন্দেশ খাওয়ার প্রতিযোগিতা, ডিগবাজি খাওয়ার কম্পিটিশন, উল্টো হাঁটার চ্যাম্পিয়ানশিপ, আরও কত কী। এমন অবস্থায় 'কামড় প্রতিযোগিতা' নামের এক খেলা চালু করা যেতে পারে, বিশেষ করে যখন মানুষের জীবনে কামড়া-কামড়ির চল দিন দিন বাড়ছে। 'কামড় প্রতিযোগিতা' – অর্থাৎ কার কামড়ের কত জোর!

তবে অনুশোচনার বিষয় হল এ হেন কম্পিটিশনে মানুষ শুরুতেই বাদ। তাদের মগজ যতই ক্ষুরধার হোক না কেন, তাদের দাঁতে তেমন ধার নেই, চোয়ালেও নেই তেমন জোর। আখও ভাল করে চিবিয়ে খেতে পারে না। রস বার করতে ঘোরাতে হয় সম্ভবত হস্তিনাপুর থেকে আমদানি করা চাকা লাগান মেশিন। মানুষের চেয়ে হনুমানের দাঁতও ঢের শক্ত।

এই কামড় প্রতিযোগিতায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন জল ও স্থলের বাসিন্দারা। তালিকায় আছেন প্রাণীজগতের নামকরা সব তারকারা। বিবিসি-র এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে তাঁদের কার কামড়ের কত জোর।

প্রথমেই বলা দরকার যে বড় বড় দাঁত থাকলে কামড়ের জোর ততোটাই প্রবল হবে তেমন কোনও কথা নেই। তা নির্ভর করে দাঁত, চোয়াল ও পেশীর মিলিত শক্তির ওপর। যেমন সমগ্র প্রাণী জগতে সবচেয়ে প্রকান্ড মুখ হল 'বোহেড' তিমির। কিন্তু তারা কামড় বসানোর তেমন প্রয়োজন বোধ করে না।

ব্লু হোয়েল বা নীল তিমি: পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী। মনে হতে পারে তার কামড়ই হবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কিন্তু কোনও মেডেলই তার কপালে জোটে নি। কারণ, দাঁতই নেই নীল তিমির। তার মুখের মধ্যে আছে এক ধরনের জাল, যার সাহায্যে জলের সঙ্গে ভেসে আসা খাদ্যসামগ্রী ছেঁকে নিয়ে তারা সোজা চালান করে দেয় পেটের মধ্যে।

স্পার্ম হোয়েল বা তিমি: প্রাণীদের মধ্যে সবছেয়ে বড় দাঁত এদেরই। তবুও ছিটকে গেলেন প্রতিযোগিতা থেকে। কারণ, কেবল নিচের চোয়ালেই তাদের দাঁত থাকে, ওপরটা দন্তহীন। কামড়ানোর ব্যাপারে তাই বেশ অক্ষমই বলা চলে।

কিলার হোয়েল বা শিকারি তিমি: নামটা তিমি হলেও আসলে তিমি নয়। জাতিতে ডলফিন। পঞ্চাশটা ধারাল তেকোনা দাঁত দুপাটিতে। তিমির বাচ্চা, সিল শিকার করে। তবে শিকার তারা দল বেঁধে করে। ফলে ব্যক্তিগত কামড় তেমন জোরাল না হলেও চলে। তাই ফাইনাল রাউন্ডে আর স্থান হল না।

বৃহৎ সাদা হাঙর: স্বর্ণ পদক জিতেছেন সকলকে হারিয়ে। মুখের মধ্যে ৩০০ ধারাল ছুরির মতো দাঁত তাঁদের। কামড়ে

এবার ২ পাতায়

গাছের বয়স ৯,৫৫০ বছর

গাছের বয়স ৯৫৫০। সিন্ধুসভ্যতা, মায়ানসভ্যতা ইত্যাদির মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলির আগে থেকেই সে পাহাড়ের বুকে মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুইডেনের ডালারমা প্রদেশের বাসিন্দা এই স্প্রুস গাছটিই **(ছবি)** এখনও

পর্যন্ত পৃথিবীর প্রবীণতম জীবন্ত গাছ হিসেবে চিহ্নিত। সায়েন্স ডেইলি'তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, স্প্রুস গাছের কঠীন প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা অপরিসীম। অবশ্য তা না হলে প্রায় হাজার ছুঁই ছুঁই বয়সে এখনও মাথা উঁচু করে রেখেছে!

ডালারমার ফুলু পাহাড়ে ওই স্প্রুস গাছের মাথায় প্রবীণতমের মুকুট উঠেছে বিজ্ঞানীদের রীতিমতো গবেষণার মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় মিয়ামির গবেষণাগারে কার্বন ডেটিং পরীক্ষার মাধ্যমে তার বয়স ধরা পড়ে। এর আগে উত্তর আমেরিকায় একটি পাইন গাছকেই সব থেকে প্রাচীন মনে করা হত, যার বয়স ৪০০০-৫০০০ বছর। কিন্তু সুইডেনের ওই পাহাড়ে উত্তরে ল্যাপল্যান্ড থেকে দক্ষিণে ডালারমা পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ২০ স্প্রুস গাছ আবিষ্কার করেন যাদের বয়স ৮০০০ বছরেরও এর বেশি।

পোকারা সব গেল কোথায়

পৃথিবীতে বড় বড় প্রাণী বিপন্ন হলে তাদের নিয়ে অনেকেই ভাবেন। তাদের বাঁচানর চেষ্টা হয়। কিন্তু অনেক ছোট ছোট প্রাণী, যেমন পোকামাকড়, যে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে তা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। অথচ বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, একটা জায়গা থেকে সেখানকার বাসিন্দা পোকারা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানকার প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। যার পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে। 'ইকোলজি' জার্নালে ইউনিভারসিটি অফ সাউথহ্যাম্পটনের গবেষকরা বলেছেন যে একটি জায়গার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে কি না তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে পোকামাকড় আর ক্ষুদ্র উদ্ভিদরা কেমন আছে তা থেকে। তাদেও অস্তিত্ব বা বিলুপ্তি থেকে বোঝা যায় সব ঠিক আছে না কি পরিবেশ নষ্ট হতে বসেছে।

এ জগতে মেরুদন্ড আছে ক'জনের?

মানুষ দু পায়ে চলে, কেউ চলে চার পায়ে। তবুও তাদের শরীরের গঠনে একটা মিল আছে। এই দু-পেয়ে বা চার-পেয়েদের সকলেরই মেরুদন্ড আছে। মেরুদন্ড আছে মাছেদেরও। তা সে তিমিই হোক বা ক্ষুদে মৌরোলা। মেরুদন্ড বা শিরদাঁড়া ছাড়া এদের চলবে না। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই লম্বা হাড়টি একান্তই জরুরী। তাছাড়া মস্তিষ্কের সঙ্গে সমস্ত শরীরের যোগাযোগ বজায় রাখে যে বিস্তৃত স্নায়ুজাল তার সংযোগস্থল হিসেবেও কাজ করে ওই মেরুদন্ড। ফলে মেরুদন্ডে তেমন মারাত্মক আঘাত লাগলে শরীরের অনেক অঙ্গপ্রতঙ্গ বিকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলা যেতে পারে মেরুদন্ড প্রকৃতির এক উত্তম সৃষ্টি। যদিও কথায় বলে সব মানুষের মেরুদন্ড নাকি সোজা নয়। এমনকী কেউ কেউ নাকি একবারে 'মেরুদন্ডহীন'! তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, মেরুদন্ড আছে ক'জনের? খুব বেশি হলে ১০ শতাংশের। এই পৃথিবীর তামাম জীবকুলে ৯০ শতাংশ প্রাণীই মেরুদন্ডহীন। অথছ ওই হাড়টি ছাড়া বেঁচে

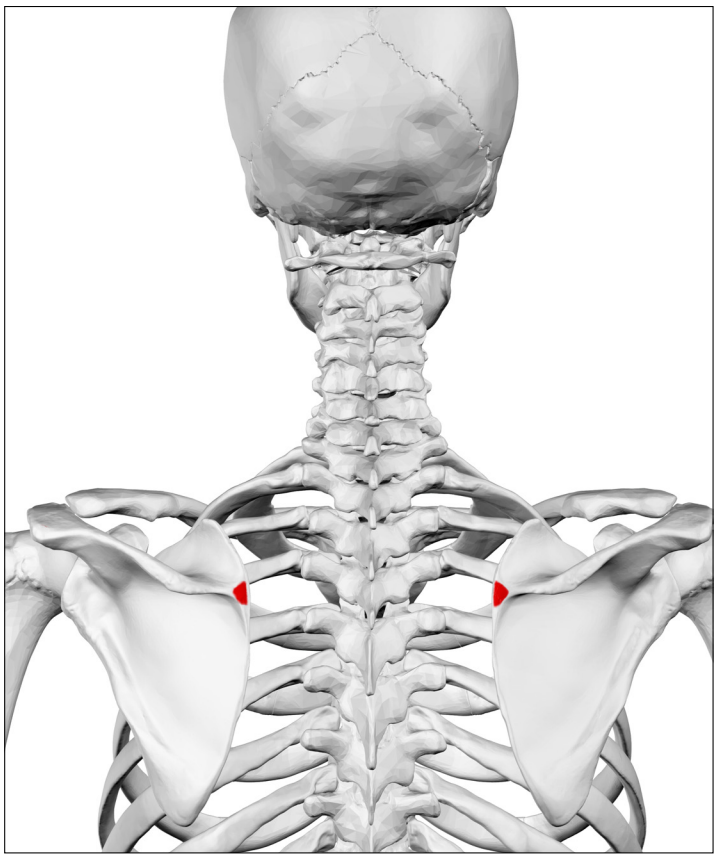

থাকতে তাদের কোনও অসুবিধে হয় না। সবকটি অঙ্গই সচল থাকে তাদের। জীবনধারণের সব ক্রিয়াকলাপ তারা সম্পন্ন করে নির্বিঘ্নে।

বিবিসি-র এক লেখায় মেরুদন্ডের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। কবে, কোন কালে মেরুদন্ডের আবির্ভাব হল প্রাণী জগতে? লেখক জশ গোব্বাটিস বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের

কী থেকে কী হয়

মাধ্যমে জেনেছেন যে মেরুদন্ডীদের আবির্ভাব ঘটে ৫০ কোটি বছর আগে। সে সময়টার নাম হল 'ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ'। আমাদের এই গ্রহের ইতিহাসে সেটা ছিল এক যুগান্তকারি সময়। কারণ, সে সময় হঠাৎই যেন পৃথিবী জুড়ে প্রাণী বৈচিত্রের এক বিস্ফোরণ ঘটে। তার আগে কোটি কোটি বছর ধরে সব কিছু এক রকমভাবেই চলছিল। ছোট ছোট এক কোষের প্রাণীরা জন্মাত, ঝাঁক বেঁধে থাকত। তারা মরে গেলে আবার জন্মাত নতুন এক কোষের প্রাণী সব। কিন্তু ৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমুদ্রে দেখা দিতে শুরু করল অদ্ভুত আকৃতির বড় প্রাণী। লম্বা মাছের মতো শরীর ছিল তাদের, তবে আজকের মাছের মতো দেখতে ছিল না। সমুদ্রের জলে তাদের সেই লম্বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে আর সাঁতরে চলায় সাহায্য করতে তাদের পিঠ বরাবর তৈরি হল শক্ত দড়ির মত কার্টিলেজ বা কোমলাস্থি।

সেই শুরু। তারপর এক এক করে সৃষ্টি হল ওই কার্টিলেজ সমৃদ্ধ হাজারও প্রাণী। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলে তাদের কারও কারও কোমলাস্থি শক্ত হাড়ের মেরুদন্ডে পরিণত হয়। আবির্ভাব হয় ছোট বড় মাছের। কিছু কিছু প্রাণী আবার জল ছেড়ে স্থলে উঠে আসার চেষ্টা করতে থাকে। আবারও কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেলে তাদের মধ্যে কিছু প্রাণীর চারটে পা গজায়, কারও দুটো। তাদের থেকেই আসে স্থলের মেরুদন্ডীরা – ডাইনসর, পাখি, টিকটিকি, গিরগিটি, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোঁড়া, আর মানুষ।

কামড়ের জোর

১ পাতা থেকে

ধরলে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর। তাদের কামড়ের শক্তি অস্ট্রেলিয়ার নিউ ইংল্যান্ড ইউনিভারসিটির গবেষকরা মেপে দেখেছেন কম্পিইউটারের সাহায্যে। দেখা গেছে তা ১৮,২১৬ নিউটন। তুলনায়, খুব সজোরে হলেও, মানুষের কামড়ের শক্তি মাত্র ১,৩১৭ নিউটন।

তবে ওই হাঙরের ক্ষেত্রে কামড়ের শক্তি মাপার কাজটা হয় কম্পিউটার মাধ্যমে। আসল কামড় কেমন হতে পারে, তা

হাতে কলমে মেপে দেখার সুযোগ হয়নি এখনও। বিজ্ঞানীদের সাহসে কুললে হয়ত তাও দেখা হবে একদিন।

সল্টওয়াটার ক্রোকোডাইল বা নোনাজলের কুমীর: স্বর্ণপদক না হলেও রুপো পেয়েছেন ইনি। কম্পিউটারে কৃত্রিম উপায়ে মাপা নয়, সরাসরি বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তার ক্ষমতা। চোয়ালের গঠন, দাঁতের সারি, দাঁতের আকার, চোয়ালের পেশি সব মিলিয়ে তার কামড়ের শক্তি প্রচন্ড – ১৬,৪১৪ নিউটন। সাদা হাঙরের থেকে একটু কম। কুমীরের কামড়কে আরও মারাত্মক করে তোলে চোখের পলকে চোয়ালের জাঁতাকল

চেপে বন্ধ করার ক্ষমতা। তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বড় বড় প্রাণীরও হয় না।

স্পটেড হাইনা: ব্রঞ্জপদক জিতে নিয়েছেন। গায়ে ছোট ছোট গোল দাগ। এই প্রজাতির হাইনা আকারে কুকুরের মত হলেও, কামড়ের জোর খুব। কুমীরের পরেই এর স্থান। জঙ্গেলে বাঘ সিংহরা তাদের শিকারের ভাল ভাল অংশগুলি খেয়ে চলে যাওয়ার পরেই আসে হাইনারা। তখন পড়ে থাকে কেবল মোটা মোটা হাড় আর সঙ্গে লেগে থাকা উচ্ছিষ্ট মাংস। সেই হাড় কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় হাইনারা। তার জন্য কামড়ের জোর লাগে অবশ্যই।

বামন মার্মোসেট

গায়ে যেন বাদামি কোট চাপানো। দেখলে অনেকটা প্যাঁচাও মনে হতে পারে। ব্রজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ও পেরুর বর্ষারণ্যের বাসিন্দা এই বামন মার্মোসেটরাই বানর প্রজাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। পুরুষদের ওজন হয় মাত্র ১৪০ গ্রাম ও স্ত্রীদের হয় ১২০ গ্রাম মতো। ফুল, ফল, পাতা, পোকাপাকড় এমনকী ছোটখাটো সরীসৃপও তারা খায়। এবং গাছের রস। গাছে ওঠা ও গাছের গায়ের ছাল খুঁড়ে রস বার করার জন্যই বোধহয় তাদের থাবার নখ খুব ধারালো হয়। আকারে খুবই ছোট্ট এবং ঘন অরণ্যের প্রাণী বলে তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।

ম্যাকাও দম্পতিরা সব কিছু ভাগ করে নেয়

মনুষ্য সমাজে স্বামী-স্ত্রী অনেক সময়ই আজীবন এক সঙ্গে কাটাতে পারে না। ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু ম্যাকাওদের সমাজে তেমনটি হবার জো নেই। শুধু যে তারা এক জনের সঙ্গে জোড় বেঁধেই সারা জীবন একত্রে কাটিয়ে দেয়, সন্তানের জন্ম দেয় তাই নয়, তারা পরস্পর খাবার ভাগ করে খায়, পরস্পকে পরিস্কার করে দেয়। ডিমে বসে যখন তা দেয় স্ত্রী ম্যাকাও, তার পুরুষ সঙ্গীটি তখন শিকারে বেরয় নিজেদের জন্য খাবার খুঁজে আনতে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অপূর্ব সুন্দর, রঙীন টিয়া জাতীয় এই পাখিটিও কিন্তু বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

সতেরো প্রজাতির ম্যাকাও আছে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বর্ষারণ্যের নানা রঙের ফল ফুলের সঙ্গে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-সাদা বর্ণিল ম্যাকাওরা যেন একেবারে মিশে থাকে। ম্যাকাওই টিয়া জাতীয় পাখিদের মধ্যে বৃহত্তম। প্রায় আড়াই তিন ফিট লম্বা হয়। বেশ লম্বা তার লেজ, তার বড় বাঁকানো শক্ত ঠোঁটটি বাদাম ও যে কোনও বীজ ভেঙে খাওয়ার জন্য একেবারে আদর্শ। ওই ঠোঁট দিয়ে কেউ কেউ নারকেল পর্যন্ত না কি ভাঙতে পারে। পশ্চিম অ্যামাজনে এক প্রজাতির ম্যাকাও আবার ভিজে মাটিও খায়। খুবই সমাজবদ্ধ

এই পাখি দশ থেকে তিরিশটি - দল বেঁধে থাকে। তাদের তীক্ষ্ণ স্বরে বনভূমি কখনও কখনও মুখর হয়ে ওঠে। রাতের বেলায় দলবেঁধে

বিপন্ন যারা

গাছের ডালে বসে ঘুমোয়। সকাল হলেই ফল, বাদাম, পোকা, শামুক ইত্যাদি খাবারের সন্ধানে দূরে দূরে পাড়ি দেয় তারা। তারা গড়ে বাঁচে ৫০-৬০ বছর। তবে কেউ কেউ ৮০ ও পার করে দেয়।

মানুষের গলার আওয়াজ, কথাবার্তা হুবহু তারা এমন ভাবে নকল করতে পারে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। ক্রীড়াপ্রিয় এই পাখিটি পোষ্য হিসেবে তাই খুবই জনপ্রিয়। তবে সেই পাখির বাজারের চাহিদা মেটাতেই অবৈধ ভাবে ম্যাকাও ধরা হয়। পাশাপাশি অরণ্য ধ্বংসও অব্যাহত। বর্ষারণ্য থেকে তাই বেশ দ্রুতই ম্যাকাওরা হারিয়ে যাচ্ছে। সতেরো প্রজাতির মধ্যে বেশিরভাগই বিপন্ন। মনে করা হয় কেউ কেউ প্রকৃতি থেকে বিলুপ্তও হয়ে গেছে।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, উইকিপিডিয়া

কলা রোগ আটকায়, স্বাস্থ্য ভাল রাখে নানা ভাবে

জেনে রাখা ভাল

আমাদের দেশে যে ফলটি ছাড়া প্রায় কোনও পুজোই হয় না, সেই কলাকে জঙ্গল থেকে তুলে এনে চাষ করার কাজ শুরু হয়েছিল ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কারও মতে ৮০০০ বছর আগেই সেই চাষের সূচনা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনির চাষিরাই প্রথম কলার চাষ করে। কলা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে -

● মধ্য প্রাচ্যে কলা পৌঁছে ছিল ইসলামের অভ্যুত্থানের আগেই। আর পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ষষ্টদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজ নাবিকদের হাত ধরে আমেরিকায় কলা পৌঁছেছিল।

● কলা নানা রকমের হয়। তবে ভারত, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই কলার বৈচিত্র সব থেকে বেশি।

● বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের কাছে কলা ফল হিসেবে অন্যতম প্রধান খাদ্য।

● শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই প্রিয় অত্যন্ত পুষ্টিকর, মিষ্টি এই ফলটির প্রধান উৎপাদক ভারত।

● বিশেষজ্ঞদের মতে নিয়মিত কলা খেলে ক্যানসার, অ্যাজমা ও হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা

কমে। কলা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

● পোটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিস, আয়রন, ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, বি, প্রোটিন, ইত্যাদি প্রচুর ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ এই কলার কিছুই ফেলা যায় না। গাছের ভেতরের অংশ (থোড়), কলার ফুল(মোচা) তো আমরা খাইই। তা ছাড়া তার আঁশ, পাতাও নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

● আর স্মৃতি শক্তি রক্ষায় ও মন ভাল রাখতে তো কলার জুড়ি মেলা ভার।

সূত্রঃউইকিপিডিয়া, মেডিকেলনিউজটুডে.কম

তাজমহল সবুজ হয়ে যাচ্ছে

তাজমহলের রঙ ক্রমেই সবুজ হয়ে উঠছে। পরিবেশবিদরা বলছেন নানা পোকামাকড়ের বিষ্ঠা জমে জমে তাজমহলের সাদা মার্বেল অনেকটা সবুজভাব পাচ্ছে। এ জন্য পাশের যমুনা নদীর দূষণও দায়ী বলে তাঁরা মনে করছেন। গত কয়েক বছর ধরেই অপরিকল্পিত নগরায়ন ও পরিবেশ দূষণে তাজমহল ক্ষতির সম্মুখীন। তাছাড়া কাছের এক তেল পরিশোধন কেন্দ্রের কারণেও তাজমহলের মার্বেল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পরিষেবা

আম সঙ্কট

মালদার আম রফতানি প্রায় বন্ধের মুখে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে এখানকার আমের প্রচুর চাহিদা ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত কীটনাশকের কারণে তারা আগেই ওই আম কেনা বন্ধ করেছে। এখন আরব আমিরশাহীও দ্বিধাগ্রস্ত।

পরিষেবা

একটাই মহাদেশ হবে একদিন

এমন যদি হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে হেঁটে হেঁটে একেবারে আলাস্কা পৌঁছে গেলাম কিম্বা প্যাটাগোনিয়া থেকে স্ক্যান্ডেনেভিয়া? ভবিষ্যতে এমনটা কিন্তু হতেই পারে। পৃথিবীর সমস্ত স্থলভূমি এক সঙ্গে জুড়ে গেল। তবে তার জন্য হয়তো ২৫ কোটি বছর লেগে যাবে। তখন গোটা পৃথিবী নিয়ে একটাই মহাদেশ হয়ে যাবে।

আজ থেকে ৫ কোটি বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে হয়তো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধাক্কা মারল। আফ্রিকা ডান দিকে এগোতে এগোতে দক্ষিণ ইউরোপের গায়ে গিয়ে জুড়ল। হয়তো এই ভবিষ্যৎবাণী অনেকটা অনুমান নির্ভর। বিজ্ঞান যাকে 'প্যাঙ্গিয়া প্রক্সিমা' বলছে।

ইলিনয়'র নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্টোফার স্কটিস এভাবেই ভাবছেন। অতীতে পৃথিবী কি ছিল, এখন কেমন এবং ভবিষ্যতে কি হতে পারে তার একটি সম্ভাব্য ছবিও তিনি অ্যানিমেশনের সাহায্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে স্কটিস বলেছেন যে, তাঁর ওই প্যাঙ্গা প্রক্সিমা তত্ত্ব খুবই দূরকল্পনার বিষয়। অবশ্য এটা

সত্য যে, মহাদেশগুলি কয়েকটি ভাসমান প্লেটের ওপর রয়েছে, যারা অনবরত নড়াচড়া করছে খুবই ধীর গতিতে। কারও গতি বছরে ১.২ ইঞ্চি, কারও গতি তার পাঁচ গুণ। সেই কারণেই তো স্কটিস'র কল্পনা সব মহাদেশ জুড়ে জুড়ে একটি হতে সময় লেগে যাবে ২৫ কোটি বছর।

মহাদেশেগুলি যে চলমান সেটার সপক্ষে ১০০ বছর আগে প্রথম প্রমান দিয়েছিলেন জামার্ন জিও ফিজিস্ট আলফ্রেড ওয়েনার। তিনিই প্রথম মহাসাগরের দুই প্রান্তে থাকা

এমনও হতে পারে

দুটি মহাদেশে একই রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পান। যার থেকে তাঁর মনে হয় যে, ওই মহাদেশগুলি নিশ্চয়ই একদা সংযুক্ত ছিল, যেখানে ওই উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বাস করত। এও আলফ্রেড বলেছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাকে জুড়ে দিলে দেখা যাবে ঠিক খাপে খাপে লেগে যাচ্ছে। তাতে মনে হয় তারা এক সময় হয়তো একই ভূখন্ড ছিল, কোনও কারণে যেন দুটো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। মাটির ওপরের মতো সমুদ্রের নীচেও পাহাড় উপত্যকা সবই রয়েছে। পরে বিভিন্ন সময় নানা দেশের ভূবিজ্ঞনীদের গবেষণা-তথ্য, বিশ্লেষণ আলফ্রেডের মতকেই সমর্থন জোগায়। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও প্রবাল বা কোরালের অসংখ্য জীবাশ্মও যেন এই কথাই বলে যে, তারা এক সময় একই মহাদেশের বাসিন্দা ছিল।

সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মেরুদন্ডী গ্রিনল্যান্ডের হাঙর

তারা পৃথিবীতে অন্তত ২৭২ বছর ধরে ঘুরে বেড়ায়! অবশ্যই মাটিতে নয়, জলে। এবং ১৫০ বছর বয়স হওয়ার আগে তারা সন্তানই প্রসব করতে পারে না। কারণ, গ্রিনল্যান্ডের মেয়ে হাঙররা তার আগে প্রাপ্তবয়স্কই হয় না প্রজননের জন্য। অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তবে সমুদ্র বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণা রিপোর্ট বলছে যে তারাই এই গ্রহের দীর্ঘজীবী মেরুদন্ডী প্রাণী।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'র একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, উত্তর আটলান্টিকের হিমশীতল জল ও গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা এই গ্রিনল্যান্ড শার্ক বা হাঙরদের আয়ু কম করে অন্তত ২৭২ বছর। তাদের শারীরিক বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে, বছরে আফ ইঞ্চিরও কম। গ্রিনল্যান্ডের একটি সংস্থা দুর্ঘটনায় মৃত ২৮ স্ত্রী হাঙরের দেহ উদ্ধার করে, মাছ ধরার সময় যারা নিহত হয়। ওই হাঙরগুলি নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালান। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জীববিজ্ঞানী জুলিয়াস নিয়েলসন জানান, মৃত হাঙরগুলির মধ্যে বৃহত্তম হাঙরের দৈর্ঘ ১৬.৫ ফিট। একেবারে সঠিক না হলেও যার বয়স মনে করা

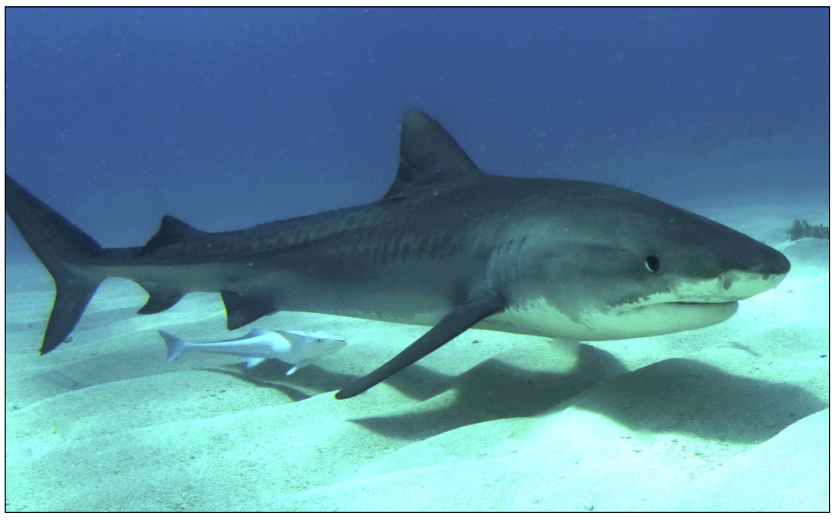

হচ্ছে কম বেশি ৩৯২ বছর। অবশ্য এটা এখনও জানা যায়নি যে, ওই হাঙররা এত দীর্ঘ দিন বাঁচে কি করে! মনে করা হচ্ছে খুব ঠান্ডা পরিবেশের জন্যই হাঙরদের শরীরের তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে তাদের শরীরের ক্ষয়ও খুব ধীরে হয় এবং তার কারণে দেহের টিসুরও ক্ষতি হয় কম। আসলে এমন প্রত্যন্ত জায়গায় তাদের বসবাস যে তাদের সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানাও যাচ্ছে না। যেমন সংখ্যায় তারা কত তা এখনও অজানা রয়ে গেছে।

তবে এই বিরল দীর্ঘজীবী প্রাণীর একটিরও যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় সেটাও কিন্তু বড় ক্ষতি। অথচ বহু দেশই এখন মেরু প্রদেশের মাছ, তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তন, যার প্রভাব পড়ছে হাঙরদের বসতিতে। ফলে পৃথিবীর এই প্রবীণতম সদস্যদের জীবনও বুঝি ক্রমশ ঝুঁকির মুখে পড়তে চলেছে।

বোর্নিওর জঙ্গলের বিচিত্র উড়ুক্কু প্রাণী সব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন নাম ছিল ‘যবদ্বীপ’ ও ‘সুবর্ণভূমি’। এক সময় দক্ষিণ ভারতের রাজা দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ ইন্দোনেশিয়াতে এক সুসমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে নির্মিত হয় বিখ্যাত বরোবদুরের স্তূপ। প্রাকৃতিক দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া খুবই বর্ণময় এক দেশ। তারই অর্ন্তগত বোর্নিও দ্বীপ। সে দ্বীপ ঘন বর্ষারণ্যে ঢাকা। আর সেই অরণ্যের আলোআঁধারিতে বাস করে বেশ কিছু বিরল উড়ুক্কু প্রাণী।

বোর্নিও দ্বীপের সেই গহন অরণ্যের বিভিন্ন উড়ুক্কু প্রাণীদের মধ্যে অবশ্যই নাম করতে হয় চুল বাঁধার ফিতের মত পাতলা ও চ্যাপ্টা ‘প্যারাডাইস ট্রি’ প্রজাতির সাপ। তার বৈজ্ঞানিক নাম ‘ক্রইসোপিলিয়া প্যারাডাইসি’। প্যারাডাইস বা স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে ওই সাপের সম্পর্ক কী তা বলা মুস্কিল। তবে বলা হয় বাইবেল আর কোরানে বর্ণিত স্বর্গের বাগানে যে সাপ প্রথম মানব আর মানবীকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল সে না কি এক গাছ থেকে অন্য লাফ মারতে পারত। আর বোর্নিওর ওই সাপও গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে চলতে পারে। তাই

উড়ুক্কু টিকটিকি

বোধহয় তার ওই নামকরণ।

আছে ‘ফ্লাইং গেক্কো’ বা উড়ন্ত টিকটিকি (টাইকোজুন কুহ্‌লি)। রাতে শিকার ধরতে বেরয় তারা। বাতাসে ভর দিয়ে লাফ মেরে অনেক দূরের গাছের ডালে গিয়ে বসতে পারে এই গেক্কো। তাদেও পায়ে থাকে খুব পাতলা চামড়া। বাতাসের চাপে সেগুলি প্রসারিত হয়ে গেলে অনেকটা পাখির ডানার মত কাজ করে। এই প্রাণীটির শরীরের নিচের দিকেও অনেকটা পাতলা চামড়া গোটান থাকে। লাফ মারার পর ওই অংশটিও ডানার মত খুলে হাওয়ায় ভাসতে সাহায্য করে তাকে।

সেখানকার গুনুঙ্গ জাতীয় উদ্যানে, বর্ষারণ্যের বুনো আম, জাম, শিশু, শাল ইত্যাদি গাছের বেড়াজালের মধ্যে বাস করে প্রায় ১৪ প্রজাতি কাঠবিড়ালী।

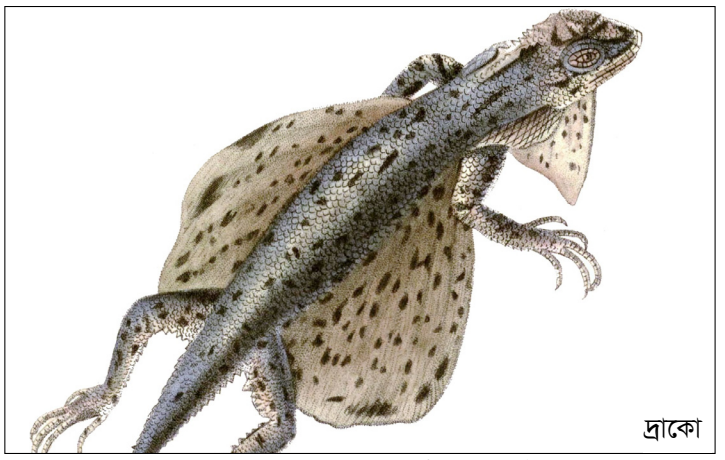
ড্রাকো

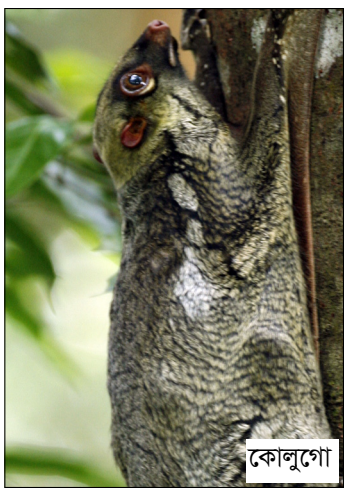
কোলুগো

তারা এ গাছ থেকে সে গাছে এমন লাফ দেয় যে দেখলে মনে হয় তারা যেন উড়ে চলেছে। আছে গেছো ব্যাঙরাও। উড়ুক্কু গেক্কোর মতই পায়ের পাতলা চামড়া প্রসারিত করে তারা হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে যায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে। তবে দেখার মত উড়ান হল ‘হারলেকুইন’ নামের এক গেছো ব্যাঙের। সোজাসুজি ভেসে যেতে তো পারেই তারা, উপরন্তু প্রয়োজনে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত বেঁকাতেও পারে তাদের গতিপথ।

গ্লাইডিং-এ অত্যন্ত পটু কোলুগো-ও। স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রায় ১৪ থেকে ১৬ ফিট লম্বা হয়। ওজন ১-২ কেজি। বোর্নিওর বর্ষারণ্য ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অরণ্যেও এদের দেখা যায়। প্রায় ২৩০ ফিট পর্যন্ত ভেসে যেতে পারে একই উচ্চতা বজায় রেখে।

আর আছে দ্রাকো। শূন্যেই পাক খেয়ে লাফ মারায় পটু ওই ক্ষুদে অথচ চটপটে প্রাণী। সে এক ধরনের গিরগিটি। তার বুকের কাছে আছে পাতলা চামড়া। লাফ দিলেই ছাতার মত খুলে যায় সেই গোটান চামড়া, আর হাওয়ায় অনায়াসে ভেসে যায় দ্রাকো। সাধারণত ১০০ ফিট মত দূরত্ব তারা বাতাসে ভেসে অতিক্রম করতে পারে। তারা দিনে খাবারের সন্ধানে ঘোরে। তাদের প্রিয় খাদ্য পিঁপড়ে আর উইপোকা। বাসস্থান দখল নিয়ে পুরুষ দ্রাকোর মধ্যে হামেসাই মারপিট হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে লড়াই চলে শূন্যে । দেখলে মনে হয় যেন দুটো বোমারু বিমান একে অপরকে তাড়া করছে।

কিন্তু বোর্নিওর এই সব বিরল প্রাণীরা আর সুরক্ষিত নয়। সেখানকার বর্ষারণ্যে চোরাশিকারীদের আনাগোনা বাড়ছে।শিকার হচ্ছে সেখানকার বিচিত্র সব প্রাণীরা। তাই শঙ্কিত হচ্ছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা। প্রশ্ন উঠছে জীববৈচিত্রে ভরপুর বোর্নিও-র অরণ্য রক্ষা করা যাবে তো?

কৌশিক রায়, সহশিক্ষক,
আবেশকুড়ি উচ্চ মাদ্রাসা
সূত্রঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

দেওয়াল লিখন

ভারতে উচ্চবিত্ত পরিবারে দিনে মাথাপিছু ২৫০ লিটার বা তার বেশি জল খরচ হয়। নিম্ন আয়ের পরিবারে মাথা পিছু ৪০ লিটার।

দ্য হিন্দু

RNI Regn No. WBBEN/2000/01531 Date of Publication: September 1, 2016 Postal Regn No.KOL RMS/262/2016-18

অবাক পৃথিবী

● নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বা কথোপকথনের জন্য মুরগিরা প্রায় ২০০ রকম আলাদা শব্দ করতে পারে।

● প্রায় ৭০০০ বছর আগে পেরুতেই প্রথম আলুর চাষ শুরু হয়।

● বাড়ির চারপাশে যদি ঠিকমত গাছপালা লাগানো যায় তাহলে এয়ার কন্ডিশনা'র প্রয়োজনীয়তা ৩০% কমে যায়।

● অস্ট্রেলিয়ান পেলিক্যানদের ঠোঁট প্রায় ২ ফুট লম্বা। পৃথিবীর তাবৎ পাখিদের মধ্যে তারাই বৃহত্তম ঠোঁটের অধিকারী।

● টুনা মাছ ঘন্টায় ৭০ কিমি বেগে সাঁতার কাটতে পারে।

আরশোলা আসছে

আরশোলা বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে না। পৃথিবীর এই আদিম প্রাণীটিকে দেখলেই আমরা তাকে দূর-দূর করি। নানা উপায়ে তাদের মেরে শেষ করার চেষ্টা চলে। কিন্তু মানুষের হাজারও আক্রমণ সত্ত্বেও তারা দিব্বি বেঁচে বরতে আছে। তবে এও ঠিক যে তারা সাধারণত জন সমক্ষে আসে না। গলিঘুঁজির অন্ধকারে তারা দল বেঁধে দিন কাটায়। কিন্তু এমনও দিন আসতে পারে যখন তারা আর অন্ধকার জগতে নিজেদের আটকে রাখতে চাইবে না। তখন তারা ডানা নেড়ে আমাদের চারপাশে ফড়ফড়িয়ে উড়ে বেড়াতে চাইবে। সে বড় সুখের দিন হবে না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা তেমনই এক সম্ভাবনার কথা বলছেন। অন্য সব পোকার মত আরশোলাও শীতল রক্তের প্রাণী। ঠান্ডা বাড়লে তারা খানিকটা জবুথবু হয়ে পড়ে। আবার স্বাভাবিক উষ্ণতায় তারা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে, আরশোলারা অতি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। আর তেমন হলে, তারা যে ঝাঁক বেঁধে আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়াবে না তা কে বলতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে তো তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা ইউনিভারসিটির প্রফেসর ও পতঙ্গবিজ্ঞানী জুলস সিলভারম্যান 'লাইভসয়েন্স'কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে আরশোলারা উড়তে পারলেও তারা প্রজাপতি বা পাখির মত উড়ে বেড়ানর ক্ষমতা রাখে না। প্রকৃতি তাদেও ডানা সে ভাবে তৈরি করেনি। প্রয়োজনে, তারা কিছুটা উড়ে যেতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু সেটা হল আজকের কথা। ভবিষ্যতে যে সব জায়গায় গরম বাড়বে সেখানে সেই উষ্ণতা আরশোলাদের আরও শক্তি জোগাবে, আর সেই সুবাদে তারা আরও বেশি দূর ও আরও বেশি সময় ধরে উড়ে বেড়াতে সচেষ্ট হবে। তারা উড়ে বেড়াবে খাবারের সন্ধানে, সঙ্গিনীর খোঁজে।

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট-হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। আমেরিকার ইতিহাসে এই চারটি শহরের কোথায় মিল?
(ক) ফিলাডেলফিলা (খ) আন্নাপোলিস (গ) নিউ ইয়র্ক সিটি (ঘ) ওয়াসিংটন ডি সি

২। প্রাচীন সভ্যতার এই চারটি নিদর্শন কোনটি কোন দেশে?
(ক)অ্যাক্রোপলিস (খ) পেরসেপলিস (গ) স্টোনহেঞ্জ (ঘ) মাচু পিচু। পেরু, গ্রিস, গ্রেট বিটেন, ইরান

৩। কার কথা বলছি?
(ক) প্রথম ব্যাটসম্যান যিনি টেস্ট ম্যাচে ৩০ এর বেশি সেঞ্চুরি করেন (খ) জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ'এ যত রান করে ছিলেন তা এখনও রেকর্ড (গ) ওয়েস্টইন্ডিজ'র বিরুদ্ধে এনার থেকে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি আর কেউ এখনও অবধি করেনি (ঘ) একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি দুটো টেস্ট'এ এক ইনিংস'এ সেঞ্চুরি আর অন্যটিতে ডাব্‌ল সেঞ্চুরি করেছিলেন

৪। আজ অবধি প্রায় ৮০০০ পর্বতারোহী এভারেস্টে উঠেছেন; পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম 'কে-২' তে এই সংখ্যা কত?
(ক) প্রায় ৪০০ (খ) প্রায় ৪০০০ (গ) ৪ (ঘ) ৪০

৫। এই চার মহিলা পারিবারিক ঐতিহ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই বিচারে এদের মধ্যে কে আলাদা এবং কেন?
(ক) ইন্দিরা গান্ধী (খ) বেনজির ভূট্টো (গ) কোরাজন আকুইনো (ঘ) আঙ সান সু চি

৬। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ১০ অক্টোবর এখনকার ইরাকে কি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল?
(ক) বিশাল ভূমিকম্প (খ) কারবালার যুদ্ধ (গ) আরব জগতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা (ঘ) জনগণের জন্য পৃথিবীর প্রথম চিরিয়াখানার উদ্বোধন

৭। এদের মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি হাওয়ার থেকে হাল্কা?
(ক) তেল (খ) হিলিয়াম (গ) পারদ (ঘ) জল

৮। এদের মধ্যে কোনটি গ্রিনহাউস গ্যাস নয়?
(ক) ওজোন (খ) মিথেন (গ) নাইট্রাস অক্সাইড (ঘ) অক্সিজেন

৯। পৃথিবীতে প্রতি বছর যত ফল আর সবজি উৎপাদন হয় তার কত শতাংশ খাবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়?
(ক) ২৫ (খ) ৪০ (গ) ৪৫ (ঘ) ৫০

১০। এই চারটি মাটির নীচের সবজির মধ্যে কোনটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম কার্বোহাইড্রেট'র উৎস?
(ক) গাজর (খ) আলু (গ) কাসাভা (ঘ) মিস্টি বীট

উত্তর: ১/ওয়াশিংটন বর্তমান রাজধানী, অন্যরা কোনও না কোনও সময় রাজধানী ছিল; ২/ক-গ্রিস,খ-ইরান,গ-গ্রেট ব্রিটেন, ঘ-পেরু; ৩/সুনীল গাভাস্কার; ৪/ক; ৫/গ, এনার স্বামী ফিলিপিনস'র বিরোধী নেতা ছিলেন, অন্যরা দেশনেতার মেয়ে; ৬/খ; ৭/খ; ৮/ঘ; ৯/গ; ১০/গ

একটি গাছ, অনেক প্রাণ

স্বত্বাধিকারি অনীশ গুপ্তর পক্ষে তাঁর দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com